দৈনিক ইত্তেফাক

28 DEC 1998

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরেই ছাত্র রাজনীতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব

কমরেড নূরুল হক মেহেদী

মহামান্য রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তব্য এবং ৩০শে নভেম্বর একটি ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে ঢাকা কলেজে গুলীতে একজন ছাত্র নিহত হওয়ার পর ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আবার বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ছাত্র রাজনীতির উপর আমার কয়েকটি লেখা দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক জনকণ্ঠে ছাপা হয়েছে। কিন্তু এর কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তাই এ বিষয়ে লেখার উৎসাহ হারিয়ে ফেলি। বিগত ৬ই ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে ছাত্র রাজনীতির উপর ডাঃ তারেক শামসুর রেহমানের লেখাটি পড়ার পর নৈতিক দায়িত্ববোধের তাগিদে আজকের নিবন্ধটি লিখছি।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের জন্য ছাত্র রাজনীতি দায়ী কিনা, ছাত্র রাজনীতি করে কেহ কেহ অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে কোটিপতি বনেছে কিনা এবং শিক্ষার মান নিচে নেমে যাওয়ার জন্য ছাত্র রাজনীতি দায়ী কিনা, এ সকল বিতর্কিত আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখলাম। এখন সর্বজনস্বীকৃত এবং প্রমাণিত কিছু বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। শিক্ষা ও সভ্যতার সূতিকাগার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত যে নির্লজ্জ ঘটনা শুধু ছাত্রসমাজ নয় গোটা জাতির ললাটে কলংকের কালিমা লেপন করল তার কি ব্যাখ্যা দিবেন ছাত্র-ছাত্রী নেতৃবৃন্দ? দিন-দুপুরে বনে-জঙ্গলে নয় বিভাগের আশেপাশেই ছাত্র সংগঠনের মস্তান নেতা-কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রীদের উপর সংঘবদ্ধ হামলা করে তাদের ইজ্জত লুট করে আসছিল। ছাত্রনামধারী নরপশুদের এসকল অপকর্ম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ ক্যাম্পাসে কারো অজানা ছিল না। বলা যায় প্রকাশ্যেই এ সকল নারকীয় ঘটনা ঘটত। সন্ত্রাসীদের হিংস্র থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কত অশ্রু ঝরেছে, কত ছাত্রী লেখাপড়ার পাঠ গুটিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। জনৈক শক্তিধর ছাত্রনেতার শততম ছাত্রী ধর্ষণের সাফল্যে ক্যাম্পাসে মিষ্টি বিতরণের জাতীয় লজ্জাজনক ঘটনার কথা কোন কোন বিখ্যাত দৈনিকে ছাপা হয়েছে। ফ্রি-সেক্সের দেশ ইউরোপ-আমেরিকায়ও এহেন ঘৃণ্য-জঘন্য ঘটনার কথা শুনা যায়নি। ছাত্র নেতৃবৃন্দের কানে এসকল কলংকজনক ঘটনার কথা কি পৌঁছেনি? নেতৃবৃন্দ বুকে হাত দিয়ে বলুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের পূর্বে আপনারা এসকল ঘটনা জানতেন না? এসকল বীভৎস ঘটনা বন্ধ করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন কি? বরং পাষান্ডদের শায়েস্তা করার পরিবর্তে দলের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য দলে টেনেছেন। এ সকল ঘটনা এমনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি কথাও আপনাদের অস্বীকার করার জো নেই। গুন্ডাদের হিংস্র ছোবলে ক্ষতবিক্ষত ও অতিষ্ঠ ছাত্রীদের উদ্যোগে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা মারাত্মক হুমকির মুখে জীবন ও ইজ্জত বাজী রেখে যখন পাষান্ডদের রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন ছাত্র সংগঠনসমূহ বিবৃতি দেওয়া এবং ক্যাম্পাসে মিছিল করার মত দায়সারা গোছের কিছু কর্মসূচী পালন করা ছাড়া কি কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সারাদেশ অচল করে দিতে পারে। দলীয় স্বার্থে অতীতে বহুবার করেছেও। আপনারা ছাত্র রাজনীতিতে কলংক লেপনকারী নরপশুদের শাস্তির দাবীতে প্রচন্ড আন্দোলন করে সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিতে পারতেন। নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করেছেন কি? কেন করলেন না, জবাব দিতে পারবেন কি? প্যাচাল করতে পারবেন কিন্তু জবাব দিতে পারবেন না।

রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হবে বলে মহামান্য রাষ্ট্রপতিসহ অনেক বিজ্ঞজন যে অভিমত প্রকাশ করছেন আমি বিনয়ের সাথে এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। কারণ রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিলেই কি বাস্তবে সম্পর্ক ছিন্ন হবে? খবরের কাগজের পাতায় ছিন্ন হবে, বাস্তবে নয়। আমি মনে করি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলেই সন্ত্রাস নির্মূল করে ক্যাম্পাসে শান্তি স্থাপন করতে পারে।

ইসলামী ছাত্র শিবির তো আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য যে কোন মুহূর্তে শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত বলে দম্ভোক্তি করে থাকেন। ইসলামী আইনে ধর্ষণ অমার্জনীয় অপরাধ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে ধর্ষণের যে তান্ডব চলেছে তাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে কি শাহাদাত বরণ হয় না? দলের জন্য মারামারি করে তো জীবন দিচ্ছেন এবং নিচ্ছেন। কিন্তু ধর্ষণের মত ধর্ম ও মানবতা-বিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কোন ছাত্রশিবির কর্মীর শাহাদাত বরণ তো দূরের কথা একটা লাঠির পিটা খেয়েছে বলেও শোনা যায়নি। এ ব্যাপারে আপনারা বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করলেন না কেন? নীরব থাকছেন কি এজন্য যে, ধর্ষিতারা ইসলামিক বিধি-বিধান মেনে চলে না? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একজন খাঁটি মুসলমানের জীবন থাকতে তার সামনে কোন বিধর্মী নারীকেও কেউ ধর্ষণ করতে পারবে না। ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের মধ্যে ইসলামী স্পিরিটের ঘাটতি দেখা দিল কেন? নেতৃবৃন্দ জবাব দিতে পারবেন কি?

ইডেন কলেজ ও বদরুন্নেসা কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের স্বার্থে ছাত্রীদের মধ্যে বটি, লাঠি এমনকি পিস্তল বোমা নিয়ে সংঘর্ষের ছবি প্রায়শ পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় এবং সংবাদের শিরোনাম হয়। খারাপ কাজেরও কোন কোন ভাল দিক থাকতে পারে। কাজেই ছাত্রীদের মস্তানীরও একটা ভাল দিক থাকতে পারে। এতে আমাদের মেয়েরা আত্মরক্ষার ক্ষমতা অর্জন করছে, সাহসী হচ্ছে। এ সকল সাহসী ছাত্রীরা যদি নারী ধর্ষণসহ সকল সামাজিক অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ত তবেই তারা নন্দিত হত, সমাজ এগিয়ে যেত। এ ব্যাপারে তাদের বীরত্বের কোন দৃষ্টান্ত তারা আজ পর্যন্ত স্থাপন করতে পারেনি। কেন পারছেন না ছাত্রী নেতৃবৃন্দ জবাব দিতে পারবেন কি? অবশ্যই পারবেন না। প্রশ্ন আসতে পারে তিনটি বড় সংগঠনের বাহিরের কোন সংগঠন সম্পর্কে কিছু বলছি না কেন? বাদবাকী ছাত্র সংগঠনগুলো সাংগঠনিক দিক থেকে এত দুর্বল যে তাদের সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার সময় এখনও আসেনি।

এখন আমি মূল প্রশ্নে ফিরে আসব। প্রশ্নটা হল ছাত্র রাজনীতি ক্যাম্পাসে ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য দায়ী কিনা? এবং সন্ত্রাস বন্ধ করার উপায় কি? ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণ নির্ণয়ের প্রশ্নে সচেতন মহলও ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। একপক্ষ বলছেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের জন্য মূলতঃ ছাত্র রাজনীতিই দায়ী, অপরপক্ষ এ মতের ঘোরতর বিরোধী। এ প্রসঙ্গে ২৯শে জুলাই, ১৯৯৭ ইংরেজী তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে "ছাত্র রাজনীতির সেকাল ও একাল" শিরোনামে প্রকাশিত আমার নিবন্ধে বলেছিলাম, "সচেতন মহলের একটি অংশের মত হল, ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাসের উৎস নয়। তাঁদের এ বক্তব্যকে মেনে নিয়েও বলা যায়, ছাত্র রাজনীতির আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চলে। সন্ত্রাসীরা কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের সাইনবোর্ডের নিচে থেকেই সন্ত্রাস করে। রাজনীতিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে বলেই কোন আঘাতই তাদের ঘায়েল করতে পারে না। তারা বীরদর্পে বিচরণ করে ক্যাম্পাসে। ছাত্র রাজনীতির আড়ালে তাদের কুৎসিত চেহারা ঢাকা পড়ে যায় বলেই তারা নেতা বনে। সংক্ষেপে ছাত্র রাজনীতির আবরণেই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চলে।" আমার উল্লেখিত সাদামাঠা ব্যাখ্যা দিয়ে সন্ত্রাসের সঠিক উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে না। সমস্যা আরও গভীরে। বাস্তব সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে দেখা যায় একটা বিশেষ রাজনীতি ও অর্থনীতি সৃষ্ট ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা তথা মানসিকতাই সন্ত্রাসী কালচারের স্রষ্টা। এ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ১লা এপ্রিল, ১৯৯৮ইং দৈনিক ইত্তেফাকে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ছাত্র সংগঠন নেতৃবৃন্দের গোল টেবিল বৈঠক ডাকুন" শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখেছিলাম, "বর্তমান সুবিধাবাদী রাজনীতি ও লুটেরা অর্থনীতির ভাবাদর্শগত প্রভাবে ছাত্র-যুবসমাজ সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে। এ বাস্তব পরিস্থিতিতে ছাত্র নেতৃবৃন্দের একাংশ টাকা ও ক্ষমতার প্রতি ভীষণভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পাওয়ার পলিটিক্স তাদের জন্য সে সুযোগও এনে দিয়েছে। তাই দেখা যায় মূল রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গেলে অঙ্গ ছাত্র সংগঠন সরস্বতীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলেও লক্ষ্মী তার ভান্ডার উজাড় করে তাদের কামনা বাসনা কানায় কানায় পূরণ করে দেয়। সাবেক সরকারের আমলের কোন কোন কপর্দকহীন ছাত্র নেতার রাতারাতি কোটিপতি বনার এবং হঠাৎ করে মন্ত্রী হওয়ার ঘটনাসমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।" দীর্ঘদিন আগের আমার দু'টি লেখার দু'টি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণ বা উৎস কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও চিহ্নিত করতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস।

গুন্ডাদের হিংস্র ছোবলে ক্ষতবিক্ষত ও অতিষ্ঠ ছাত্রীদের উদ্যোগে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা মারাত্মক হুমকির মুখে জীবন ও ইজ্জত বাজী রেখে যখন পাষান্ডদের রুখে দাঁড়িয়েছিল তখন ছাত্র সংগঠনসমূহ বিবৃতি দেওয়া এবং ক্যাম্পাসে মিছিল করার মত দায়সারা গোছের কিছু কর্মসূচী পালন করা ছাড়া কি কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সারাদেশ অচল করে দিতে পারে। দলীয় স্বার্থে অতীতে বহুবার করেছেও। আপনারা ছাত্র রাজনীতিতে কলংক লেপনকারী নরপশুদের শাস্তির দাবীতে প্রচন্ড আন্দোলন করে সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিতে পারতেন। নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করেছেন কি? কেন করলেন না, জবাব দিতে পারবেন কি?

ডঃ তারেক শামসুর রহমান দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নকলবাজী এবং শিক্ষকদের কর্মকান্ডের যে নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের আরেকটি উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি লিখেছেন ছাত্র-নেতাদের তদবিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকুরী হয়। এমনকি উপাচার্য নিয়োগেও তারা পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি আরও লিখেছেন এসব ছাত্র নেতা এত ক্ষমতাবান যে, এরা বিশ্ববিদ্যালয় চালায়। উপাচার্য এদের কথায় চলে। (ইত্তেফাক ৬-১২-৯৮)। যারা ছাত্র নেতাদের তদ্‌বিরে চাকুরী পায় তারা ঐসকল নেতাদের সকল অপকর্মকে শুধু হজম করে না, গোপনে সহায়তা করতেও বাধ্য থাকে। কোন কোন শিক্ষকের সন্ত্রাসীদের প্রতি পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্ন সমর্থন নিয়ে এর আগেও কথা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের কলমে বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ায় এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। এতে প্রমাণিত হয় সরিষাতেই ভূতের বাসা। তিনি একজন শিক্ষক হয়েও সাহস করে বলেছেন অধিকাংশ শিক্ষক রাজনীতি, এন,জি,ও, কনসালটেন্সি এমনকি গার্মেন্টস ব্যবসায় ব্যস্ত থাকেন: বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার মত তাদের সময় খুবই কম। যে প্রতিষ্ঠানের একাংশ শিক্ষকদের চরিত্র এরূপ সে প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা সন্ত্রাসী হবে নাতো কি হবে? এ প্রসঙ্গে এক লেখায় আমি লিখেছিলাম "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক সন্ত্রাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বা সম্পর্কিত প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে সে শিক্ষককে চাকুরীচ্যুত করতে হবে।" (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪শে এপ্রিল ১৯৯৭ইং) ডঃ তারেক শামসুর রহমানের প্রবন্ধ পড়ার পর ব্যবসায়ী শিক্ষকদের ব্যাপারেও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হরদম নকলবাজী চলছে। চলবে না কেন! নকল করা আজ আর কোন অপরাধ নয়। আজ থেকে প্রায় দু'যুগ আগে প্রকাশ্যে ব্যাপকহারে নকলবাজী শুরু হয়েছে। কাজেই অপ্রিয় সত্য হল স্কুল-কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ নকল করে পাস করে এসেছে। এ সকল নকল করা শিক্ষক নিজেরাই কিছু শিখেনি, তারা ছাত্রদের কি শিখাবে?

সম্প্রতি নব্য কোটিপতি কালো টাকার মালিকদের নিজ গ্রাম এলাকায় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-মসজিদ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল ধনী গুলশান-বনানী-বারিধারার প্রাসাদে বাস করলেও সাধারণত নির্বাচন প্রার্থী হয় মফস্বলের নিজ জন্মস্থান থেকে। একদিকে সুনাম অর্জন অপরদিকে নির্বাচনের কথা ভেবেই নিজ নিজ এলাকায় কিছু কাজ করছে। নামের জন্য হোক আর ভোটের জন্য হোক এলাকায় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা প্রশংসনীয় কাজ। রাজনৈতিক কারণে কোন কোন কলেজে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় অনার্স-মাষ্টার্স দূরের কথা পাস কোর্সে পড়ানোর মত কোন শিক্ষকও নেই। নামকাওয়াস্তে কিছু শিক্ষক থাকে যাদের শিক্ষকতার কোন যোগ্যতাই নেই। কিন্তু পড়া-শুনা হোক বা না হোক কলেজের রেজাল্ট ভাল করতেই হবে অন্যথা সরকারী রিকগনিশান বাতিল হতে পারে বা সরকারী অনুদান কমে যেতে পারে। সুতরাং ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলে মিলে-মিশেই গণ-নকলের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরীক্ষার হলে গার্ডেরা পরীক্ষার্থীদের গার্ড না দিয়ে গার্ড দেয় ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শকদের। বহিরাগত ইনভিজিলেটরদের আসতে দেখলেই হলের গার্ডরা ছাত্রদের রেড সিগন্যাল দিয়ে থাকে। তবে এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। তবে তা নগণ্য। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শকরা কোন ছাত্রের নকল ধরে সে এলাকায় থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসা কঠিন। এলাকার মানুষ মনে করে কলেজটা থাকার দরুন তাদের ছেলে-মেয়েরা বাড়ী থেকে যাতায়াত করে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং যে কোন মূল্যে কলেজটা টিকিয়ে রাখতে হবে। পরীক্ষার সময় যে পরিমাণ ছাত্র বহিষ্কৃত হয় তারা নকলকারী ছাত্রদের অতিক্ষুদ্রতম অংশ। কিছু সৎ শিক্ষক ও বহিরাগত পরিদর্শক জীবন বাজী রেখে কাজ করে বলেই বহিষ্কারের কিছু কিছু ঘটনা ঘটে।

এসকল কলেজে শুধু পড়াশুনা হয় না তা নয়, অবৈধ পথে অর্জিত অর্থে নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মনোজগতে এক বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা দেখে ঘুষ, দুর্নীতি, সরকারী সম্পত্তি আত্মসাৎ এমনকি স্রেফ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে যে লোকটি কোটিপতি বনেছে সে লোকটি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার বদৌলতে এলাকার কৃতী সন্তানের খেতাব লাভ করে, দানবীর মহামানবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। এতে ঐ প্রতিষ্ঠানের এবং আশপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা কি শিক্ষা পায়। তারা দেখে চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি লুটপাট করে টাকা করতে পারলেই ভোট পাওয়া যায়, সম্মান পাওয়া যায়, কৃতী সন্তান হওয়া যায়। নীতি-আদর্শ বিবর্জিত একজন লোকের অবৈধ অর্থে নির্মিত প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত করার পরিবর্তে অন্ধকার জগতের প্রতি মোহগ্রস্ত করে। তাই আজকাল ছাত্র-যুবসমাজকে বলতে শোনা যায় "আরে বাদ দাও, বাদ দাও ঐ সকল নীতি-আদর্শের কথা, নীতি ধুয়ে খেলে পেট ভরে না। দেখছ না আমাদের এলাকার কৃতী সন্তান কর্পদহীন অবস্থা থেকে কিভাবে রাতারাতি কোটিপতি হয়েছে। এটা জানা সত্ত্বেও কেউ তাঁকে ঘৃণা করে না বরং তাঁর প্রশংসা করতে পারলেই নিজকে ধন্য মনে করে। আবার এটাও সত্য তিনি টাকার জোরে এম,পি পরে দলবদল করে মন্ত্রী হতে পারছেন বলেই এলাকার জন্য এত কিছু করতে পারলেন"। এ মন-মানসিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আজকের ছাত্র-যুবসমাজের অধঃপতন ঘটছে। এসকল ছাত্র-ছাত্রীর একাংশ এসব সন্ত্রাসী মানসিকতা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এ মানসিকতাও বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণে দেশের শিক্ষার মান আশংকাজনকভাবে নীচে নেমে গেছে। শুধু রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নয় গত বছর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত এক জাতীয় সেমিনারে বক্তারা দেশের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান বিশ্বমানের নয় (জনকণ্ঠ, ২২-১১-৯৭ইং)। শিক্ষার মান এত নিচে নেমে গেছে যে, দুনিয়ার কোন দেশ এখানকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাকে স্বীকৃতি দেয় না। এর থেকেও বুঝা যায় আমাদের শিক্ষার মান কত নিচে নেমে গেছে।

আমাদের যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যাতে আর ক্ষতি হতে না পারে সে পথ ও প্রন্থা নির্ধারণ করাই আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। ১৯৭৬ সালে তৎকালীন সামরিক শাসক এক সামরিক ফর্মান বলে ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত করার বৈধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ছাত্র সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত করার ফলে রাজনীতিবিদরা উলঙ্গভাবে ছাত্রদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার আইনী সুযোগ লাভ করে। এটা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের জন্য বহুলাংশে দায়ী এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হবে বলে মহামান্য রাষ্ট্রপতিসহ অনেক বিজ্ঞজন যে অভিমত প্রকাশ করছেন আমি বিনয়ের সাথে এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। কারণ রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিলেই কি বাস্তবে সম্পর্ক ছিন্ন হবে? খবরের কাগজের পাতায় ছিন্ন হবে, বাস্তবে নয়। আমি মনে করি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলেই সন্ত্রাস নির্মূল করে ক্যাম্পাসে শান্তি স্থাপন করতে পারে। এ সম্পর্কে ১লা এপ্রিল, ১৯৯৮ইং দৈনিক ইত্তেফাকে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ছাত্র নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক ডাকুন" শিরোনামে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে বলেছিলাম, "গত বছর সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সহ-অবস্থানের ফলশ্রুতিতে বেশ কিছুদিন ক্যাম্পাসে শান্তির কপোত ডানা মেলে উড়েছিল। এ ঘটনা আমাদের সামনে কাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল শক্তিকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। তা হল প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছাই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য যথেষ্ট। সোজা কথায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ চাইলে মুহূর্তের মধ্যে সন্ত্রাস নির্মূল করে ক্যাম্পাসে শান্তি স্থাপন করতে পারে। রিমোট কন্ট্রোলারটা ছাত্র-ছাত্রী নেতৃবৃন্দের হাতে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ শান্তি স্থাপনে সংকল্পবদ্ধ হলে রাজনৈতিক দলগুলো চাইলেও ক্যাম্পাসকে অশান্ত করতে পারবে না। একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে তাদের ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহানব্রতে উজ্জীবিত করতে পারেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করুন। বৈঠকে ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপর ক্যাম্পাসে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব ছেড়ে দিন এবং সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে নেতৃবৃন্দকে সম্ভাব্য প্রশাসনিক সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিন। সাথে সাথে এজন্য একটা চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিন। ছাত্র-ছাত্রী নেতৃবৃন্দকে স্পষ্ট বলে দিন, তারা আপনার বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলে আপনি সাময়িকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধসহ যেকোন কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন। এ পথে আপনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন।" কিন্তু আমার সুপারিশ যে হালে পানি পায়নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এ প্রস্তাব কার্যকরী হলে গোটা দেশের মানুষ এটা জানত। আমার একটি কেন হাজারটা সুপারিশ কার্যকরী না হলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমন করতে না পারলে কিছুই আসবে না শুধু যাবে। তাই সন্ত্রাস নির্মূল করে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরী হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জাতির সামনে এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের (আংশিক) সাফল্য জাতিকে একটা পথের সন্ধান দিয়েছে। যে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের দাপটে ক্যাম্পাস থরথর করে কাঁপত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব জেনেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস করত না। সরকারী আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষ তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহস করত না; কারণ দুর্বৃত্তরা যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তখন সে দলের হয়ে যায়। রাজনৈতিক দলগুলো বাছ-বিচার না করে দলীয় স্বার্থে তাদের সাদরে গ্রহণ করে। ফলে তাদের অতীতের সব অপরাধ মাফ হয়ে যায়। এহেন দুর্ধর্ষ দস্যুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে কোন ছাত্র সংগঠন নয়, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। এ সংগ্রামে কোন ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগ নেওয়া তো দূরের কথা বরং একটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে। এমনকি প্রতিবাদী ছাত্রীদের শারীরিক নির্যাতন করেছে। তাদের শিক্ষিকার প্রতি অসম্মানজনক ও অশালীন আচরণ করেছে। কিন্তু হুমকি-ধমকি, নির্যাতন-নিপীড়ন সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীদের দমাতে পারেনি। তারা জীবন ও ইজ্জত বাজি রেখে লড়ে গেছে। তাদের দৃঢ়তার কারণে অপরাধীরা ধরা পড়েছে। কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের বিচার করতে বাধ্য হয়েছে এবং সামান্য হলেও শাস্তি পেয়েছে। প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন অপরাধীদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে। এটাই সংগ্রামের সাফল্য, এটা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিজয়। এ বিজয় গোটা জাতির বিজয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম প্রমাণ করেছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসীদের দুর্গে আঘাত হানতে পারে তবে কোন ছাত্র সংগঠন তো দূরের কথা, সরকার ইচ্ছা করলেও সন্ত্রাসীদের রক্ষা করতে পারে না। তাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আরও দু'একটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তবে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা "মাস্তান খেদাও আন্দোলন" শুরু করে দিবে। আর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাস থেকে "মাস্তান খেদাও আন্দোলনই" পারে ক্যাম্পাসে শান্তি স্থাপন করতে। তাই বলি, একমাত্র জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরেই ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত করে, ছাত্র রাজনীতির কলঙ্ক মোচন করে ছাত্র রাজনীতি লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। □